অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ৭ই আগষ্ট১৯৭১, মৃত্যু ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫১

জোড়াসাঁকোর ৫ ও ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে ঠাকুর পরিবারের দুই শাখায় এককালে বঙ্গদেশের অনেক কৃতী সন্তানের জন্ম হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদেরই অন্যতম। ব্যক্তিগত জীবনে অবনীন্দ্রনাথের বাবা গুণেনন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন রবীন্দ্রনাথের খুড়তুতো ভাই। দুই পরিবারের সংস্কৃতিতে কোন তফাত ছিল না। তাই পারিবারিক পরিবেশ ও চরিত্রধর্মে অবনীন্দ্রনাথ অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি ছিলেন। আবাল্য রবীন্দ্রনাথের অনেক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তরুণ বয়সে নাট্যভিনয়ে, প্রথম যৌবন স্বদেশি কর্মকান্ডে, বা শেষ জীবনে শান্তিনিকেতনে শিল্পসাধনায় তাঁর জীবনের অনেকটাই বরীন্দ্রসান্নিধ্যে কেটেছিল। সাহিত্যরচনায় হাত দিয়েছেন, তাও রবীন্দ্রনাথেরই অনুপ্রেবণায়। আবার অপর দিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তফাতও অনেক। রবীন্দ্রনাথের জীবন যেমন শুধু সাহিত্যরচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে বহুবিচিত্র কর্মধারায় ব্যক্ত হয়েছিল, অবনীন্দ্রনাথের তা নয়। তাঁর বাইরের জীবন ঘটনাবিরল, কারণ তিনি কর্মী পুরুষ ছিলেন না। নিজ প্রতিভার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না আদৌ। ঘরকুনো মানুষ তিনি, কখনও বিদেশে পা বাড়ান নি, এমন কি সংবর্ধনা নিতেও তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল। তাঁকে ঘিরে একদা যে ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল, এবং তাঁরই চারপাশে বৃহৎ শিল্পীমণ্ডলী গড়ে উঠেছিল তাঁদের কাজের প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল, এ সবও তিনি চেষ্টা করে সচেতনভাবে করেছিলেন এমন নয়। এই আত্মমগ্ন, নিভৃতচারী, বহুশাখায়িত শিল্পচর্চার ধারক ব্যক্তিটির জীবনকাহিনী মূলত : তাঁর শিল্পীসত্তারই ইতিহাস।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জান্মষ্টমী তিথিতে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের সেকালে নিয়ম মেনে স্কুলে যাবার বাধ্যবাধকতা ছিল না। অবনীন্দ্রনাথও সে অর্থে শৈশবে স্কুল পালানো ছেলে। তবে বাড়িতে প্রথাগত শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক সংস্কৃতির উদার আবহাওয়ায় দেশী ও বিদেশী সাহিত্য, সংগীত ও নাটকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। হিন্দুমেলার প্রভাবে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের যা কিছু সম্পদ তার প্রতি অনুরাগ বদ্ধমূল হয়েছিল। আর পেয়েছিলেন সুন্দরকে চেনবার চোখ। তাঁর বাবা গুনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে তৎকালীন অভিজাতদের ভালো লক্ষণগুলি পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাঁর উদার সামাজিকতা, উচ্চশ্রেণীর নাচ গান অভিনয়ের মজলিশ, দুর্লভ গাছপালা ফুলফল দিয়ে সাজানো বাগান, দেশবিদেশ থেকে সংগ্রহ করে আনা শিল্পদ্রব্য দেখতে দেখতেই তিনি বড় হয়েছিলেন। গুনেন্দ্রনাথের অকালপ্রয়াণের পর পরিবারের ভিতরকার সেই জৌলুশ নিভে গেল বটে, কিন্তু সেখান থেকে পাওয়া সুরুচি টুকু বালকের চিত্তকোষে মধুর মত রয়ে গেল।

তরুণ বয়সে পৌঁছে শুরু হল অবনীন্দ্রনাথের আসল শিক্ষা। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজে, এবং ইংরাজি শিখবার জন্য সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে কিছুদিন করে পাঠ নিলেন। চিত্রবিদ্যায় স্বাভাবিক দক্ষতা আছে দেখে গুরুজনেরা বলেছিলেন ভালো করে আঁকা শিখতে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি গিলার্ডি ও পামারের মত বড় মাপের শিক্ষকের কাছে ছবি আঁকার করণ কৌশল আয়ত্ত করলেন। এস্রাজ বাজানো শিখবার জন্য গুরুর কাছে রীতিমত নাড়া বেঁধে দক্ষিণা দিয়ে চর্চা শুরু হল। অবনীন্দ্রনাথের নিজের মতে ঐ-শেষোক্ত বিদ্যাটা বেশিদূর এগোয় নি। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে দেখলে সেটুকুও যে নেহাৎ ফেলনা ছিল তা নয়। হাতের টিপ ঠিক হয়েছিল। তালে মানে নির্ভুল বাজনা বাজাতে পারতেন। যা শুনতেন তৎক্ষণাৎ তা বাজাতে পারতেন, যে কোনো গানের সুর তুলে নিয়ে মনে রাখতে পারতেন। যা পারতেন না তা হল নতুন কোনো সৃষ্টি। তাই অবনীন্দ্রনাথ বুঝে গেলেন এটা তাঁর স্বক্ষেত্র নয়। তিনি তখনই অল্প অল্প টের পেতে শুরু করেছেন যে ছবির জায়গাটা তাঁর কাছে অন্যরকম। সেখানে মনের অনেক ভিতর থেকে তাঁর কাজটা বেরিয়ে আসে। এখানে নতুন কিছু করবার অনুপ্রেরণা তাঁর ভিতরে আছে। এইসব নিজস্ব হিসাবনিকাশ, সন্ধান ও সমন্বয়, তিনি সমাধা করলেন তাঁর বয়ঃসন্ধিকালের মধ্যেই। একুশ বাইশ বছর থেরেই আমরা চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের সূচনা ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করতে পারি।

সেকালের প্রথা অনুযায়ী তাঁর শিক্ষা শুরু হয় পাশ্চাত্য রীতিতে - তেলরং, প্যাস্টেল, পোর্ট্রেট ড্রইং, পরে হাতির দাঁতের ওপর মিনিয়েচার এসব তিনি শেখেন। এ সবই তাঁর শিক্ষানবিশি পর্ব। সেই সময় যখন তাঁর বছর চব্বিশ বয়স, সময়টা ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি, তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে তিনি পার্শিয়ান ছবির একখানি অ্যালবাম উপহার পান। এতে প্রাচ্য চিত্রকলার যে নমুনা তিনি পান তাতে তাঁর চোখ খুলে যায়। তিনি দেশীয় রীতি খুঁজছিলেন। তখন এদেশের চিত্রজগতে সেটা ছিল না। রবিবর্মার যে সব ছবির খুব খ্যাতি ছিল তার বিষয় ছিল দেশী, কিন্তু অঙ্কনরীতি পশ্চিমি, এবং তাও খুব উন্নত নয়। কিন্তু এখন তিনি দেখলেন দেশী পদ্ধতির একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাকে তিনি অনুকরণ করলেন না, অনুসরণ করে, কল্পনা মিশিয়ে বৈষ্ণবপদাবলীর রাধাকৃষ্ণলীলার কিছু ছবি আঁকলেন। চণ্ডীদাসের দুটি ছত্র -

পৌখলী রজনী পবন বহে মন্দ।

চৌদিকে হিমকর হিম করে ফন্দ।।

এই নিয়ে আকঁলেন প্রথম দেশী ছবি 'শুক্লাভিসার'। এই হল সূচনা। এরপর সারা জীবন ধরে নানা রীতি থেকে তিনি ভাববীজ সংগ্রহ করেছেন। অজন্তার চিত্রকলা থেকে কালিঘাটের পট, রাজস্থানী চিত্ররীতি থেকে জাপানী অলংকরণ প্রণালী, কোথা থেকে তিনি প্রয়োগবিদ্যা না শিখেছেন বলা যাবে না। সব রকম উপকরণ তিনি গলিয়ে নিয়েছেন নিজের মনের রসায়নে। তাঁর ভাষায় - তুলিটি জলে ডুবিয়ে, রঙে ডুবিয়ে, মনে ডুবিয়ে তবে ছবি আঁকতে হয়।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীর একটা মোটামুটি তালিকা দেওয়া হল। এই তালিকা নির্মাণ করেছেন শ্রী সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী প্রবন্ধে। (অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতি - সম্পাদনা বিশ্বনাথ দে, করুণা প্রকাশনী) তাঁর উৎস বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলির অবনীন্দ্রসংখ্যার বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের রচনা এবং রবীন্দ্রভারতীর প্রদর্শনী। তালিকাটি এইরকম -

১। ১৮৯০ -এর পূর্বের কোনও ছবি উল্লেখযোগ্য নয়।

২। ১৮৯০ - ৯৫ - ছাত্রজীবনের অল্প কয়েকটি স্কেচ

৩। ১৮৯৫-১৯০০ - মধ্যযুগীয় ভারতীয় টেকনিকের সঙ্গে পরিচয় - দিল্লি কলম, বা মুঘল রাজপুত কাংড়া শিল্পধারার সঙ্গে পরিচয়, একজন ইউরোপীয় মহিলার কাছে ইউরোপীয় মিনিয়েচার রীতির পাঠ - গ্রহণ, ই.বি. হ্যাভেলের সংস্পর্শে আসা, কৃষ্ণলীলা সিরিজের ছবি।

৪। ১৯০০ - ১৯১১ বিখ্যাত জাপানী শিল্পী ইয়োকোহামা ও হিশিজার সঙ্গে পরিচয় ও জাপানী রীতির শিক্ষাগ্রহণ। এ সময়ের বিখ্যাত ছবি সন্ধ্যাপ্রদীপ, ভারতমাতা, দারার ছিন্নমুণ্ড, ওমর খৈয়াম চিত্রাবলী।

৫। ১৯১১ - ১৯২০ পুরীতে আঁকা কয়েকটি ছবি। প্রকৃতিচিত্রের মধ্যে symbolic ভাবের প্রাধান্য।

৬। ১৯২০ - ১৯৩০ Structural Aspect of Communication এর দিকে ঝোঁক এবং প্যাস্টেল আশ্রয়। আরব্য উপন্যাস সিরিজ এই সময়ের।

৭। ১৯৪০ - আমৃত্য ছবি আর বিশেষ আঁকেন নি। খেলনা তৈরি ও কুটুম কাটাম নিয়ে সময় কাটিয়েছেন।

তাঁর চিত্রগুলিকে বিশেষজ্ঞ ও শিল্পরসিকেরা নিম্নলিখিত শ্রেনীগুলিতে সাজিয়েছেন।

১। মুঙ্গের পর্যায় - বুদ্ধজন্ম বিষয়ক চিত্র

২। কৃষ্ণলীলা পর্যায় - কৃষ্ণজন্ম, রাখাল কৃষ্ণ, কৃষ্ণের গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তন, কৃষ্ণ ফুলওয়ালি, মাঝি কৃষ্ম, মধুরার রাজা কৃষ্ণ, কুপিতা রাধা, মধুরাযাত্রার প্রাক্কালে বিদায়, বিরাহিনী রাধা প্রভৃতি।

সৃষ্টিসন্ধান

৩। তাজ নির্মান, সাজাহানের মৃত্যু, মেঘদূত, ভারতমাতা, কুমারস্বামীর প্রতিকৃতি প্রভৃতি।

৪। মুক্তাঙ্কন পর্যায় - রতি, কাম, প্রেমিক, উজীর-ই আজাম, রাজা, মহাদেব, নারদ, পুরীর চন্দনতলা প্রভৃতি।

৫। মোহমুদ্গর পর্যায় - দশখানি ছবি

৬। পাখি ও জীবজন্তু - বৌ কথা কও, বক, শকুনি, প্রভাতকালে গাভীবৎস, শ্বেতময়ুর, লালমোহন, বুলবুল, হরিন প্রভৃতি।

৭। ফাল্গুনী পর্যায় - অনু বাউল বেশে রবীন্দ্রনাথ, কবিশেখর বেশে রবীন্দ্রনাথ, দক্ষিন হাওয়া, শীত, শীতের বিদায়, সর্দারের দীনুবাবু ইত্যাদি।

৮। মুসৌরি পর্যায় - হিমালয়ের ল্যাণ্ডস্কেপ।

৯। দার্জিলিং পর্যায়- কুলিমেয়ে, ফলওয়ালি, ক্যালকাটা রোডের, গুম্ফা, অবজারভেটারি গিরিশৃঙ্গ, কাঞ্চনজঙ্ঘা, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলপথ ইত্যাদি।

১০। খেলার সাথি - ভালু (কুকুর), বিড়াল, হরিণ, বসন্তসেনা, জেবুন্নেসা, কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাত, বৈরাগী, যীশুখৃষ্ট, ভারতীয়, সূফি, জাহাঙ্গীর বাদশাহ, ধূসর, পারাবদ, ইত্যাদি

১১। রাঁচি পর্যায় - বাঘ পাহাড়, সাঁওতীল নাচ, ইত্যাদি

১২। দেওঘর পর্যায় - কয়েকটি ল্যান্ডস্কেপ

১৩। ওমরখৈয়াম পর্যায় - দ্বার খোলো, পেয়ালা ও বল প্রভৃতি

১৪। সাহজাদপুর পর্যায় - উল্লাপাড়া স্টেশন, বজরা, করতোয়ানদী, তালগাছি হাট, গোয়ালাদের গ্রাম, সাহাজাদপুর সেতু, জমিদারি কাছারি, বন্যা, নাপিতের কুটীর, কাছারিরাড়ি ইত্যাদি।

১৫। মুখোশ পর্যায় - নানা পরিচিত জনের মুখোশ

১৬। আরব্য উপন্যাস পর্যায় - সাহজাদি গল্প বলছেন, সওদাগররা ও দৈত্যগণ, সিন্দবাদ নাবিক, নুরুদ্দিনের শাদি ইত্যাদি অনেকগুলি ছবি।

১৭। কবিকঙ্কন চণ্ডী - চণ্ডীমঙ্গল কেন্দ্রিক ২৪টি ছবি।

১৮। কৃষ্ণমঙ্গল পর্যায় - কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত ২১ টি ছবি

১৯। ছায়াছবি পর্যায় - হরদুয়ারি বাবা, রাতের পাখি, কালপেঁচা, পারাবত, ছাতার মালিক, পেচক, শুকনো পাতা, বেলেঘাটার বুলবুল, বর্ষার দিনে, শিশুগাছ, পাখিরূপে সাত ভাই ইত্যাদি।

২০। পারাবত পর্যায় - চারটি ছবি

২১। হিতোপদেশ পর্যায় - কপোতদের ঝগড়া। গঙ্গার জন্ম প্রভৃতি।

লেখক অবনীন্দ্রনাথ

যাঁরা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অনেক সময় দেখা যায় তাঁদের একদিকের কৃতিত্বের গৌরবে অন্য দিকের কাজগুলি ঢাকা পড়ে যায়। অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে। তাঁর চিত্রকর সত্তার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে তাঁর লেখক পরিচয়।

তরুণ বয়সে অবনীন্দ্রনাথ যখন নানা বিদ্যা শিক্ষা করছিলেন তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি লেখক হবেন। বরং অভিনয়ে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল এবং সে জন্য মনে ঈষৎ আত্মপ্রসাদও ছিল। রবীন্দ্রনাথের বা জ্যোতিরিন্দ্র নাথের নাটকগুলি যখন ঠাকুরবাড়ির ছাদে স্টেজ বেঁধে অভিনয় হত তিনি সেগুলিতে সর্বদাই অংশ নিতেন। অনেক সময় সাজ বদলে বদলে একই নাটকে নানা ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। কমিক অভিনয়ে তাঁর আলাদা রকম কৃতিত্ব ছিল। এ ছাড়া আর একটা জিনিসও তিনি খুব ভালো পারতেন - তা হল জমিয়ে গল্প বলা। তাঁর এই সব কাজ থেকে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন তাঁর মধ্যে সেই অনুভব শক্তি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি আছে যা ভালো লেখক হবার জন্য দরকার। তাঁরই বারংবার অনুরোধে অবনীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত কলম হাতে তুলে নেন। লেখা হয় শকুন্তলা (১৮৯৫)। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের গল্প অবলম্বনে এ এক রূপকথা। গল্পটি অবিকৃত আছে। কিন্তু তা বলা হয়েছে চিরকালীন কথকভার সুরে, শিশুর কাছে যে সুরে মায়েরা যুগ যুগান্তর ধরে গল্প বলে এসেছেন সেই রকম একটি অনির্দেশ্য সুর এই রচনায় লগ্ন হয়ে আছে। ঐ একই ভঙ্গীতে তিনি লিখেছিলেন ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৬) , রাজকাহিনী (১৯০৯), নালক (১৯১৬), ভূতপতরীর দেশে (১৯১৫), খাতাঞ্চির খাতা (১৯২১) গঙ্গায় স্টিমারে বড়িয়ে বেড়ানোর গল্প। লেখার ভঙ্গীতে সেখানে স্বপ্ন ও সত্যের মিশ্রন ঘটেছে। তাঁর প্রবন্ধের বই আছে যার মধ্যে পড়ে বাংলার ব্রত (১৯০৯), এবং বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (১৯২১ - ২৯)। এই শেষোক্ত গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিল্পাবিষয়ক বক্তৃতামালা। তাঁর বইয়ের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ধারাবাহিকভাবে যে লিখে গেছেন তাও নয়। বোঝাই যায় চিত্রচর্চার ফাঁকে ফাঁকে এগুলি লিখেছেন খানিকটা মনকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যাবার জন্য। আপাতদৃষ্টিতে বেশির ভাগ রচনাই শিশুসাহিত্য। কিন্তু এর ভেতরকার রোমান্টিক সৌন্দর্য, সুদূরতা, এবং অদ্ভুতরস ঠিক শিশুদের সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকবার নয়। এগুলির প্রকৃত সমজদার পরিণত পাঠকেরাই।

শেষে তাঁর দুটি বই ঘরোয়া (১৯৪১) এবং জোড়াসাঁকোর ধারে (১৯৪৪)র উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। বই দুখানির লেখিকা রাণী চন্দ, কিন্তু তাঁর ভূমিকা অনুলেখকের, বই দুটির কথক অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের কাছে তাঁদের যৌবনকালের গল্প শুনতে শুনতে রাণী চন্দের মনে হতো এ সব অমূল্য কথা লিপিবদ্ধ করে রাখারই যোগ্য। তিনি কিছু কিছু নোট নিতেন। রবীন্দ্রনাথ তখনও জীবিত। এ কথা শুনে তিনি উৎসাহিত হন এবং শ্রীমতী চন্দকে বলেন যত পারো সংগ্রহ করে রাখতে। সেই প্রচেষ্টারই ফল এই বই দুখানি। বই দুটি অবনীন্দ্রনাথের নিজের হাতে লেখা না হলেও রাণীচন্দের রচনা কৌশলে অবনীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরটি যেন শুনতে পাওয়া যায়। তাঁর রচনারীতির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য এই গ্রন্থ দুটিতে আছে। তার সঙ্গে আছে ঠাকুরবাড়ির ও তৎকালীন বঙ্গদেশের কিছু হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস। অবনীন্দ্র চর্চায় এই বই দুটি অপরিহার্য।

কুটুম কাটাম

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের বাড়িটি ছেড়ে জীবনে কোথাও যান নি। শেষজীবনে সেই বাড়ি যখন মারোয়ারি ব্যবসাদারের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাঁকে অন্যত্র থাকতে হল তখন সেটা তাঁর বুকে খুবই বেজেছিল। এই নতুন পর্যায়ে এসে তিনি আর বিশেষ ছবি আঁকেন নি। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকর্ম থেমে থাকে নি। সাহিত্যে তিনি নানা অদ্ভুতরসের যাত্রাপালা লিখেছেন গদ্য পদ্য মিশিয়ে, আর শিল্পের ক্ষেত্রে তৈরি করেছেন খেলনা। কাট কুটো ও অন্যান্য পরিত্যক্ত জিনিস দিয়ে তৈরি সেই সব পুতুলকে তিনি বলতেন কুটুম কাটাম। তাঁর পুরনো চাকর বলেছিলো - বাবু এসব আপনি ফেলে দিন। দিনরাত কাটকুটো নিয়ে যে কি করেন, সবাই বলে আপনার ভিমরতি হয়েছে।' প্রিয় শিষ্য নন্দলাল বসু বলেছিলেন। আপনি এখন দূরবিনের উল্টো দিক দিয়ে পৃথিবী দেখছেন।' আর অবনীন্দ্রনাথ নিজে মনে করতেন শিল্পদেবতার খাসদরবার পার হয়ে তিনি এখন অন্দরমহলে এসেছেন। এখানে শিল্পী ভাবে বিভোর হয়ে মায়ের হাতের শিশুর মত শিল্পকে আদর করছেন ও সাজাচ্ছেন। সম্ভবত : এ তিনটিই সত্য।

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

সৃষ্টিসন্ধান